মিলনসাগর
www.milansagar.com

এক মুঠো মন

জ্যোতিষ দত্তগুপ্ত

"বেশ পুজো পুজো ভাব" তাকিয়ে দেখি ধুতি ও গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক। চেহারায় এবং পোশাকে Glamour না থাকলেও চট করে চোখ ফেরানো মুশকিল, মুখে এক সরল হাসি। ১৯৬১ সালের এক শরৎ সকালে এ ঘটনা।

"এখানে ত বাঙালী ছেলেরা এত সাত সকালে শিউলি ফুল কুড়োতে আসে না— আপনি কি দিল্লীতে প্রথম এসেছেন?" প্রথম পরিচয়ের আর বিশেষ কিছু মনে নেই— শুধু সেদিনের একটু শিহরণ জাগানো অনুভূতি ছিল কারণ ওর পরিচয় যখন পেলুম।

এই সেই কবি সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র? পূর্ববঙ্গের মফঃস্বল শহরে দেশ ভাগের আগে এক স্কুল বালককে স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। "বেশ পুজো পুজো ভাব" ছোট্ট একটি কথা কিন্তু অসাধারণ তার ব্যাপ্তি। "রথী ত' আপনাদের College-এর অধ্যাপক চেনেন কি?" রথীন্দ্র মৈত্র চেহারায় সাজে বনেদি ভাব, "আমরা ওকে ত' Prince বলতাম, আমার মাসীমার বাড়ীর পেছনেই ওদের বিশাল বাড়ী।" পেছনের বারান্দা থেকে তার সাজানো Studio আমাকে অনেক প্রেরণা দিয়েছে।

মাসীমার কাছে যতটুকু শুনেছি আপনারা ত' বেশ বড় গোছের জমিদার।

"হ্যায় জমিদারই বটে" একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস। প্রথম দিনের আলাপ এখানেই শেষ।

এরপর বহুদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, এর মধ্যে আমি বাড়ী বদল করে ওঁর বাড়ীর কাছে চলে আসি। করোলবাগের মত জায়গায় বাড়ীর সামনে একটু জমি যেখানে বাগান করা যেতে পারে। বাঙালীর প্রিয় ফুল চামেলী, জুঁই, মাধবীলতা, রজনীগন্ধা সব নিয়ে আমার ছোট বাসার ৮ × ৮ ফুটের ঘর ওকে একদিন টেনে এনেছিল। ওঁর বাড়ীও বেশী দূরে নয় বড় জোর ১০০/১৫০ গজে আসা যাওয়ার পথে ছিল।

প্রথমদিন এসেই ডিভানের ওপর পাতা হরিণের চামড়ার ওপর বসে পড়লেন ধ্যান করার মত, একটু রসিকতা করে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। "তোমার Studio কোথায়?" Studio বলতে ছড়ানো ছিটানো Canvas রঙ তুলি Packing বাক্সে বই antiqe হাঁ কাব্যের বইও ছিল। ছিল না ওঁর বই। ওঁর প্রিয় বন্ধুদের বই ছিল সুধীন দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি বিষ্ণু দে (যিনি আমার অধ্যাপক ছিলেন)। খুব খুশী হলেন তাই দেখে। খুব বড় মাপের মানুষের এটাই লক্ষণ— অন্যের রচনা কবিতাই হোক বা সাহিত্য কি ছবিই হোক দেখে ভাল বলা এবং তার প্রশংসা করা। সেদিন মনে হল মানুষ জ্যোতিরিন্দ্রকে বোধ হয় একটু একটু চিনতে পারছি। "তুমি করে সম্বোধন করলে কিছু মনে করবেন না ত?" না, না, নিশ্চয়ই বলবেন। খুব খুশিই হব। "তোমার এ ঘরটিতে বসে যদি কবিতা লিখি কোনো অসুবিধা হবে কি?" মনে আছে সেদিন কিছু না বলে ঘরের দ্বিতীয় চাবিটি ওঁর হাতে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। "আরে না না আমি এমনি মজা করছিলাম—তবে হ্যাঁ তোমার ঘরে আসবো, সকলেই আসবো, কবিতাও লিখবো।"

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

বটুকদার বড় ছেলে শান্তনু পরদিন এসে বলে গেল ওর বাবা আমার ছোট্ট ঘরের মায়ায় পড়েছেন। বাবা আবার নতুন উদ্যমে কবিতা লিখবেন বলছেন। আমাদের বাড়ীতে বড্ড হৈ চৈ হয়। বিশেষ সকালেই যখন তাঁর কবিতা লিখবার mood আসে। সেটা ১৯৬২-র শেষ কিংবা ১৯৬৩-র প্রথমদিক— বটুকদা একদিন সকাল ১১টায় এলেন। এই প্রথম আমার ঘরে তাঁর আড্ডার সূত্রপাত। একা নয় সঙ্গে সাংবাদিক শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ''দরবেশ''— ওর সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল। দুজনেই ভাবুক— বলা যেতে পারে ভাববিলাসী।

একজন সমাজ সচেতন কবি— সমাজকে জাগাবার মন্ত্র নিয়ে কলম হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশভাগের পর যে পরিবর্তিত সমাজ চেয়েছেন তা না পেয়ে দুঃখে হতাশায় প্রায় ভেঙে যেতে বসেছেন, অন্যজন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে ভালবাসেন—মিশর থেকে কাবুল হয়ে বঙ্গের সমতলে।

সেই ১৯৬২ কিংবা '৬৩ সালের এক সকালে এসে বললেন, ''এক কাপ গরম গরম দুধ খাওয়াতে পার'' মনে মনে ভাবি বলেন কি, চা নয়, কফি নয়, গরম দুধ খাবেন? সেদিন ওঁকে শুধু দুধ দিয়ে নয় তার সাথে টোস্ট-ওমলেট দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলাম। আপ্যায়ন না বলে সেবাই বলা উচিত। সদ্‌ব্রাহ্মণের সেবা করে এমন পুণ্যার্জন করতে উঠতি বয়সের সব শিল্পীই চায়। একটু ছোঁয়াতে যদি নাম হয়— বিশেষ করে তিনি যদি বড় মাপের এক কবি হন। সেদিনের সে পুণ্য অর্জন বা পরমপ্রাপ্তি নিজের জন্য না হলেও বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যের এক পরম প্রাপ্তি ছিল।

নবজীবনের গান ও মধুবংশীর গলি-র অধ্যায়ের পর নতুন সংযোজন হ'ল নাজির হোসেনকে দিয়ে অর্থাৎ রাজধানী কবিতা ও তার পরবর্তী অধ্যায়। এর পর ৪/৫ দিন সকালে এলেন ২/৩ ঘণ্টা সময় নিয়ে রাজধানী ও আরো অনেক কবিতা শেষ করলেন। এসব কবিতার পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় সংসদের কাছে হয়ত থাকতে পারে নচেৎ ছাপাখানার কালি পরিষ্কার করার কাজে লেগেছে। দেখে মনে হল পাঁচদিন একনাগাড়ে লেখালিখি করে এক অপার্থিব তৃপ্তি বোধ করলেন।

ওঁর কথায়, ''কবিতা আমি লিখি মাঝে মধ্যে বিশেষ করে পুজো আসবার আগে বিভিন্ন পাড়ায় পুজো সংখ্যার জন্য— তাতে ভাব থাকলেও ভাবনা থাকতো না— আর এসব পড়ার মত নয়— কবিতার সঙ্গেই হয়ত ছাপা হতো মশলা বা শাড়ী কাপড়ের দোকানের কুরুচিকর বিজ্ঞাপন।''

কিছুদিন বিরতি— আবার কবিতা নিয়ে ভাবতে লাগলেন— এবারে কোনো নবজীবনের গান নয় মানুষের অতৃপ্তি লাঞ্ছনাময় এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ— যা ওঁকেও বাদ দেয়নি, তাই বেরিয়ে এসেছে একের পর এক। এরই মধ্যে বেঁচে থাকার এক প্রবল বাসনা শহর থেকে দূরে প্রকৃতির মধ্যে ''কর্বণী'' মাথায় ঘুরপাক করছে— যাকে পায় তারই সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ হয়। বিশেষ করে আমার শিল্পী বন্ধু ইন্দ্রজয়ের সঙ্গে এ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যায়। ছবি এঁকে নক্সা তৈরি হচ্ছে। মাঝে মধ্যে 'বাস্তুশাস্ত্র' ছকে হয়ত এদিক ওদিক করে দিলাম ওঁর মনঃপূত হল না। জমি নেই ত প্ল্যান তৈরি— কারা কোথায় ঘর করবে তার নামও ছকে লিখে ফেললেন। কিন্তু যে থাকবে সে জানে না। কল্পনা যে ঘুড়ির সুতো সেটা নিজেও জানেন।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

একচোট হেসে একটা গানের কলি দিয়ে সে আড্ডা শেষ করলেন। 'কর্ষণী' কর্ষণ হল না কিন্তু "এক টুকরো জমি দাও" ত' আমাদের দিলেন।

এ সময়ে বঙ্গীয় সংসদের হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা শুরু করার পরিকল্পনা হয়। বটুকদার শিশুসুলভ উৎসাহ দেখে সবাই খুব খুশী। নিজেই একদিন এসে বললেন, 'অজন্তা' নামটা কেমন লাগছে, নামের ভেতর 'ছবি ছবি ভাব' তাই না। জ্যোতিষ তুমি এর অলঙ্করণ করবে ত? তবে অজন্তার গুহার মত বড় দেওয়াল না থাক ভাড়া বাড়ীতে যতটুকু জায়গা পাওয়া যাবে তাতে বটুকদা ত থাকবে, এটা হলেই ভাল— নিয়ম করে বটুকদা ত কবিতা লিখবেন— আমাদের সে উৎসাহে অজিতবাবু (দত্ত মশায় বলে পরিচিত) ভোলা ব্যানার্জী এবং শম্ভু মুখার্জী ও আরও অনেকের অবদান মনে করার মত কেননা এরই পরিপূর্ণ ফল পেয়েছি "যে পথেই যাও" বঙ্গীয় সংসদ প্রকাশিত তাঁর কবিতা বই-এ।

১৯৭০-এর শেষদিকে আমি করোলবাগ থেকে রাজেন্দ্রনগরে চলে আসি। সে ঘর নেই, আগের মত কবিতার ভাবনা নিয়ে বসতেন কিনা জানিনা। মাঝে মধ্যে আসতেন, হাতে সময় নিয়ে আসতেন সেই সকালেই। এখানেও প্রথম দিনের করোলবাগের বাড়ীতে এসে যেমন সব ঘর দেখতে চেয়েছিলেন রাজেন্দ্রনগরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রান্না ঘরের পাশে একটু ছোটোমত বারান্দা তাতে কয়েকটা গাছ দু'খানা বেতের চেয়ার— দূরে সালোয়ান স্কুলের দেওদার গাছের সারি— কল্পনার সূতো ছাড়তে কোনো অসুবিধা ছিল না। রান্নাঘর দেখে আমার স্ত্রীকে বললেন, "বোধ হয় স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও রান্নাঘর মিনিয়েচার পেন্টিং দিয়ে সাজাবার কথা ভাবতে পারেননি— তুমি যেটা করে দেখালে।" এখানে বসেও উনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

এ সময়েই আমার কাজের ক্ষেত্র তার মাত্রা এবং পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় তাঁর সাথে যোগাযোগ কমে যায়— তবে মাঝে মধ্যে সকালে গ্রীণপার্কে অফিসে চলে আসতেন। ১৯৭২ সালে মে মাসের এক সকালে এলেন। মনটা বিক্ষিপ্ত ভারতীয় কলাকেন্দ্রর সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল অনেকদিন থেকে তা এখন চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বানিয়া পরিবারের লোক— তাদের ব্যবহারে তাঁকে "বারবার লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হচ্ছে" এ কথা প্রায়ই বলতেন। মে মাসের সেই সকালে এসে পর পর দু'কাপ চা খেলেন। নিজেই বললেন আমার ওখানে লাঞ্চ সেরে কলাকেন্দ্রে যাবেন বিকালে। আমি ত খুব খুশী ওঁকে অনেকদিন পর কিছুক্ষণ ত' আমার কাছে পাব। নিজেই টেবিলের ওপর পড়ে থাকা অফিস এর প্যাড টেনে নিয়ে কিছু একটা লিখতে বসলেন— কবিতা নিশ্চয়ই নয়, এত বাজে কাগজে কবিতা লিখবেন? তাও এত ছোটো কাগজ। আড়চোখে দেখতে পাচ্ছি আগের মত মনোযোগ দিয়ে লিখতে পারছেন না অনেক ভাবনা চিন্তা যেন ওঁকে তাড়া করছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে কাগজটি বাড়িয়ে দিলেন, "কেমন হয়েছে বল ত? তোমাদের মত ত আঁকতে পারি না— কিছু একটা ত হয়েছে? আমি ত হতভম্ব কবিতার সঙ্গে আঁকা— দুইয়ে মিলেমিশে একাকার। শুধু বটুকদাকে মনে করিয়ে দিলাম কবিতার নীচে তারিখ এবং সন দিতে— সই ত থাকবেই। যে কোনো সৃষ্টিশীল রচনায় এ তিনটে শব্দ না থাকলে পরবর্তী সময়ে যারা তার ওপর গবেষণা করবেন তারা বেশীদূর এগোতে পারবেন না।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

যাঁরা ওঁকে চিনতেন বিশেষ করে গণনাট্য আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে ওঁর ভূমিকা এবং বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনে তাঁর অবদান। তাঁরা এ বিষয়ে "রাজধানী"-র বটুকদা হয়ে ওঠার পেছনের বটুকদাকে তুলে ধরতে পারবেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঠিক পরিচয় আমরা তখনই পেতে পারি। বটুকদাকে নিয়ে সাংবাদিক বন্ধু সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেকবার কথা হয়েছে। ওকে নিয়ে দরিয়াগঞ্জের বাড়ীতে গিয়েছি পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় নি। ওদের পরিবার এ আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। এ লেখা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব ওকে নিতে অনুরোধ করেছি "জানিনা সেটা কবে সফল হবে।"

শেষেরও শেষ আছে তাই দিয়েই শেষ করছি। এরপর এলেন ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর ২০ তারিখে। দেখে খুবই কষ্ট হল। এ বটুকদা যেন আমার চেনা বটুকদা নয়। যার সঙ্গে হাসি গল্প করে সময় কাটিয়েছি। অস্থিরতা যেন ওঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে। অনেক ঘটনা যা অঘটন বলা যায় তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বৌদির প্রয়াণে। কলাকেন্দ্রের ব্যবহার আগের মতই। বেশ সময় নিয়েই এসেছিলেন। পর পর দু'টি কবিতা লিখলেন, "জ্যোতিষ এগুলো যত্ন করে, রেখে দিও, তোমার বৌদি মারা যাবার পর এই আমার প্রথম কবিতা। সন, তারিখ, সই সবই ঠিক আছে।" এরপর আর বহুদিন দেখা পাইনি। আমিও রাজেন্দ্রনগর থেকে চিত্তরঞ্জন পার্কে পাকাভাবে প্রবাসী বাঙালি হয়ে গেলাম (মনের দিক থেকে নয়)। ১৯৭৩-এ দু'তিন দিন আমার বাড়ী এসেছিলেন— এ পাড়াতেই ওঁর ছোট ছেলে সিদ্ধার্থর শ্বশুরবাড়ী। এক সঙ্গে দুই পাখী মারা বলা যেতে পারে— মানে ওঁর বুড়ি ছোঁয়া।

শেষ দেখা কলকাতা যাবার কিছুদিন আগে। কথা দিয়েছিলেন আর একদিন আসবেন জ্যোৎস্না রাতে (সে সময় এ পাড়ায় বিশেষ বাড়ী হয়নি, সামনে বাঁয়ে ডানে পিছনে খালি জমি, সামনে আরাবল্লী পর্বতের বন, বন না বলে জঙ্গল বলা যায়) রাতভোর গান গাইবেন বলেছিলেন। 'তুমি তোমার বন্ধুদের বলে রেখো, তোমার মন্টুদাকে (শ্রী শরদিন্দু ঘোষ রায়) বলে ওর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা যাবে, সুমন্ত, আদিত্যকে বোলো।

সেই ভাল লাগার দিনটা আর ফিরে আসেনি আমাদের ইচ্ছে অধরাই রয়ে গেল। মাঝে মধ্যে আফশোস করে বলতেন, "কোলকাতা এখানকার লেখকদের পাত্তা দিতে চায় না প্রবাসী বাঙালি কি বাংলা জানে? দেখি যদি একটু কলকে পাই কোলকাতা গিয়ে 'কর্ষণ'ও মাথায় রয়েছে।"

জানিনা উনি কতটুকু কলকে পেয়েছেন বা তাঁর 'কর্ষণ' আকর্ষণই রয়ে গিয়েছে।

এই লেখাটি, ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবার্তা বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।